**বামাক্ষ্যাপার মাথার ব্রহ্মতালু বিদীর্ণ হয়ে গেল**

এক মহাযোগীর এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করার দিন। ১৯১১ সাল, শ্রাবণ মাস। বামা বুঝেছিলেন, তাঁর ডাক এসেছে।

ঝড়ের আগের নীরবতা

সারা জীবন যিনি মা তারার সাথে শিশুর মতো আবদার করেছেন, ঝগড়া করেছেন, কখনো বা অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছেন—জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি ধীরস্থির। পঞ্চমুণ্ডির আসনে শেষবারের মতো বসলেন সাধক। দেহ জরাগ্রস্ত, দুর্বল। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো? জবা ফুলের মতো টকটকে লাল, জ্বলছে এক অলৌকিক আগুনে।

চারপাশে শিষ্যরা উৎকণ্ঠায় কাঁদছে। তারানাথ, নিগমানন্দ—সবাই উপস্থিত। কিন্তু বামার দৃষ্টি তখন এই স্থূল জগৎ পেরিয়ে কারণ সমুদ্রে নিবদ্ধ। তিনি বিড়বিড় করছেন না, জপ করছেন না। তিনি কেবল অপেক্ষা করছেন।

অন্তিম মুহূর্তের সেই রোমহর্ষক দৃশ্য
ধীরে ধীরে শ্মশানের কোলাহল ছাপিয়ে নেমে এল এক পিনপতন নীরবতা। যোগীরাজ তাঁর সমস্ত প্রাণশক্তিকে মূলাধার থেকে টেনে ঊর্ধ্বমুখী করছেন। দেহের প্রতিটি রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছে। উপস্থিত ভক্তরা দেখলেন, এক অদ্ভুত, অপ্রার্থিব কম্পন শুরু হলো বামার শরীরে। এ যেন এক আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের প্রস্তুতি। শ্বাস স্তম্ভিত হয়ে আসছে। প্রাণবায়ু কণ্ঠনালীতে এসে আটকেছে। সাধকের মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে।

শিষ্যরা ভয়ে ও বিস্ময়ে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে।
"মা! তারা! এলি মা?"—
সহসা মহাশ্মশানের সেই ভুতুড়ে স্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে এক সিংহগর্জন শোনা গেল। এ কোনো যন্ত্রণার কাতরানি নয়, এ হলো সন্তানের তার মায়ের প্রতি এক তীব্র, ব্যাকুল আকুতি—
"মা! ও মা তারা! এলি? এতক্ষণে সময় হলো তোর?"
সেই তীব্র আহ্বানের সাথে সাথেই ঘটল এক অকল্পনীয় ঘটনা, যা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অতীত। কথিত আছে, সেই মুহূর্তেই এক প্রচণ্ড শব্দে বামাক্ষ্যাপার মাথার চাঁদি বা ব্রহ্মতালু বিদীর্ণ হয়ে গেল।
ব্রহ্মতালু বিদীর্ণ করে মহাপ্রয়াণ: মহাশ্মশানে বামাখ্যাপার অন্তিম গর্জন "মা!"

যোগশাস্ত্র মতে, একেই বলে 'মহাসমাধি' বা 'কপাল মোক্ষ'। যে খাঁচায় এই দুর্দান্ত প্রাণপাখি এতদিন ছটফট করছিল, মায়ের কোলে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সেই খাঁচার দরজা ভেঙে সে উড়ে গেল। ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে রক্ত ফোয়ারা ছুটল, আর সেই রক্তধারার মাঝেই মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল তারাপীঠের ভৈরব।
শ্মশান আবার শান্ত হলো। শিমুল তলায় পড়ে রইল এক অবধূতের নশ্বর দেহ। উপস্থিত ভক্তরা স্তম্ভিত, বাকরুদ্ধ, অশ্রুসজল। তাঁরা চোখের সামনে দেখলেন কীভাবে একজন জীবন্মুক্ত পুরুষ স্থূল দেহ ত্যাগ করেন।

বামাখ্যাপার এই মৃত্যু কোনো সাধারণ প্রয়াণ ছিল না। এটি ছিল এক মহাজাগতিক

মিলন। সারা জীবন যে মায়ের জন্য তিনি পাগল হয়ে ঘুরছেন, অন্তিম মুহূর্তে নিজের ব্রহ্মতালু ফাটিয়ে সেই মায়ের সত্তাতেই তিনি লীন হয়ে গেলেন। তাঁর সেই শেষ আর্তনাদ "মা" আজও যেন তারাপীঠের বাতাসে কান পাতলে শোনা যায়।
যোগশাস্ত্র অনুসারে, উচ্চস্তরের সাধকেরা যখন স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁদের প্রাণবায়ু সুষুম্না নাড়ী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে নির্গত হয়।

বামাক্ষ্যাপার ক্ষেত্রেও এই মহাসমাধির ঘটনাটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।